বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৩ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২

বাংলাদেশের কৃষির প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির উৎস এবং কৃষির কাঠামোগত রূপান্তর

কাজী সাহাবউদ্দিন*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর কাঠামোগত পরিবর্তন। এর ফলে গত চার দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ক্রমেই কমেছে। সত্তরের দশকে কৃষির অবদান ছিল মোট জিডিপির ৫০ শতাংশ, যা কমে আশির দশকে এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। জিডিপিতে কৃষির অবদান আরও কমে ১৯৮৯/৯০ সালে প্রায় ৩০ শতাংশ, ১৯৯৯/০০ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ এবং ২০০৯/১০ সালে প্রায় ২০ শতাংশ হয়েছে (সারণি ১)। জিডিপিতে কৃষির অবদানের এরূপ হ্রাস সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি এখনো প্রধানত কৃষিভিত্তিক। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশের বেশি কৃষি খাতে নিয়োজিত। অধিকন্তু অর্থনীতির অন্যান্য খাতের উন্নয়নের জন্য কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ আন্তসংযোগ (linkages) নিশ্চিত করছে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির উপর কৃষি খাতের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

কৃষি খাতের মধ্যে শস্য ও হর্টিকালচার হচ্ছে প্রধান উপখাত। দেশের মোট কৃষি জিডিপিতে এ উপখাতের অবদান আশির দশক জুড়ে প্রায় ৬৫ শতাংশ ছিল, যা কমে ২০০৯/১০ সালে প্রায় ৫৬ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে অশস্য কৃষির (যেমন পশুপালন, বন এবং মৎস্য উপখাত) অবদান বেড়েছে। শস্য ব্যতীত অন্যান্য সকল উপখাতের একত্রে অবদান ২০০৯/১০ সালে দাঁড়ায় ৪৪ শতাংশের কাছাকাছি, যা ১৯৮০/৮১ সালে ছিল প্রায় ৫৬ শতাংশ। গত তিন দশকে পশুপালন উপখাতের অবদান প্রায় স্থির থাকলেও বন ও তৎসম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের অবদান সামান্য এবং মৎস্য উপখাতের অবদান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায় (সারণি ১)।

বিগত দুই দশকে বার্ষিক ৩.৩ শতাংশ হারে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। কৃষির প্রবৃদ্ধির এ হার জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের (১.৪ শতাংশ) চেয়ে বেশি হলেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির (৫.৩ শতাংশ) হারের চেয়ে কম। নব্বই দশকের তুলনায় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। এর প্রধান কারণ হলো পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় পরবর্তী সময়ে শস্য উপখাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন। বস্তুত মৎস্য ব্যতীত কৃষির সব উপখাত পরবর্তী সময়কালে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। নব্বই দশকের তুলনায় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (২০০০/০১-২০০৯/১০ সময়কালে) মৎস্য

* প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিআইডিএস। প্রবন্ধটি রিভিউ করে দেয়ার জন্য লেখক জনৈক রিভিউয়ারের নিকট কৃতজ্ঞ।

উপখাতের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। যদি এরূপ না ঘটতো তাহলে কৃষির প্রবৃদ্ধি আরও বেশি হতো। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মৎস্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী হলেও নব্বই দশকে অর্জিত প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশি ছিল না (সারণি ২)।

সারণি ১

জিডিপিতে কৃষি উপখাতের অবদান এবং কৃষির মূল্য সংযোজনের গঠন

(শতকরা হার)

	১৯৮০/৮১	১৯৮৯/৯০	১৯৯৯/০০	২০০৯/১০
		জিডিপিতে অংশ		
শস্য ও হর্টিকালচার	২১.১	১৮.০	১৪.০	১১.৪
পশুপালন	৪.২	৩.৬	২.৯	২.৬
বন ও তৎসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড	২.২	২.০	১.৮	১.৭
মৎস্য	৪.৭	৪.২	৫.৯	৪.৫
মোট	**৩২.২**	**২৮.৬**	**২৪.৬**	**২০.২**
		কৃষি জিডিপিতে অংশ		
শস্য ও হর্টিকালচার	৬৫.৬	৬৫.৫	৫৭.১	৫৬.৩
পশুপালন	১৩.০	১২.৬	১১.৮	১৩.১
বন ও তৎসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড	৬.৮	৭.১	৭.৩	৮.৫
মৎস্য	১৪.৬	১৪.৮	২৩.৮	২২.১
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উৎস: বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

টীকা: মোট জিডিপি ও কৃষি জিডিপিতে উপখাতের অংশ বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত জিডিপি সিরিজের (১৯৯৫-৯৬ সালের স্থির মূল্যে) উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

সারণি ২

বিগত দুই দশকে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার: ১৯৯০-২০১০

	১৯৯০/৯১-২০০৯/১০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	২০০০/০১-২০০৪/০৫	২০০৫/০৬-২০০৯/১০
কৃষি	৩.৩	৩.০	৩.৬	৩.৫	৪.১
শস্য ও হর্টিকালচার	২.৭	১.৫	৩.২	২.১	৫.১
পশুপালন	৩.৬	২.৫	৪.৮	৫.৬	৩.৫
বন ও তৎসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড	৪.৪	৩.৬	৪.৯	৫.৪	৫.৩
মৎস্য	৪.৯	৭.৭	৩.৫	১.৮	৪.১
জিডিপি	৫.৩	৪.৮	৬.১	৬.৪	৫.৯
জনসংখ্যা	১.৪	১.৮	১.২	১.৩	১.৩

উৎস: বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

টীকা: সুনির্দিষ্ট পিরিয়ডের উপাত্তের জন্য সেমি লগ ফাংশন ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার হিসাব করা হয়েছে।

২। শস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনে ধানের অবদান সর্বোচ্চ। দেশের মোট শস্য উৎপাদনের ৭০ শতাংশ আসে ধান থেকে এবং মোট আবাদি এলাকার ৭৫ শতাংশে ধানের চাষ হয়। শস্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি ধানের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। তিনটি প্রধান মৌসুমে বিভিন্ন প্রজাতির ধানের আবাদি এলাকা, একরপ্রতি ফলন ও উৎপাদনের বিভাজন সারণি ৩-এ দেখানো হলো। ধান উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার ১৯৭৩-২০১০ সময়কালে ২.৮ শতাংশ হিসাব করা হয়েছে, যার জন্য ধানের ফলনের বৃদ্ধিই (২.৬ শতাংশ) বহুলাংশে দায়ী। ধানের একরপ্রতি ফলনের এ বৃদ্ধি হয়েছে বহুলাংশে নির্দিষ্ট জাতের ফলন বৃদ্ধির পরিবর্তে স্থানীয় প্রজাতির ধানের জায়গায় উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ। বস্তুত গত চার দশক ধরে ধানের স্থানীয় ও উচ্চফলনশীল জাতের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে মাত্র ১.১ ও ০.৮ শতাংশ (সারণি ৩)।[১]

সারণি ৩

বাংলাদেশে ধান শস্যের আবাদি এলাকা, ফলন ও উৎপাদনে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার

(শতকরা হার)

শস্য	১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০			১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০			১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০			১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০			২০০০/০১-২০০৯/১০		
	আ. এলাকা	ফলন	উৎপাদন	আ. এলাকা	ফলন	উৎপাদন	আ. এলাকা	ফলন	উৎপাদন	আ. এলাকা	ফলন	উৎপাদন	আ. এলাকা	ফলন	উৎপাদন
আউশ (স্থানীয়)	-৫.৮৬	১.৩৫	-৪.৫১	-১.৬৯	০.৯০	-০.৭৯	-৩.১৭	১.৯২	-১.২৫	-৬.৩১	০.১৬	-৬.১৫	-১২.১১	০.৫২	-১১.৫৯
আউশ (উফশী)	২.০৩	-০.৪৩	১.৬০	২৩.৩০	-৩.৪২	১৯.৭৮	-১.৭০	-২.৬৫	-৪.৩৫	২.৩৫	০.৯৮	১.৩৭	৪.৩৬	১.৪৭	৫.৮৩
আউশ (মোট)	**-৩.৯২**	**১.৮১**	**-২.১১**	**০.০৯**	**২.৮৩**	**২.৯৩**	**-২.৯৩**	**০.৭৯**	**-২.১৪**	**-৪.১২**	**০.৯১**	**-৩.২১**	**-৩.৭০**	**২.৪০**	**-১.৩০**
আমন (স্থানীয়)	-২.৯৮	০.৬৩	-২.৩৫	০.৪৫	৩.৪০	৩.৮৫	-৩.০২	১.২০	-১.৮১	-২.৯৩	-০.৭৫	-৩.৬৮	-৬.২৭	-০.৫৮	-৬.৮৫
আমন (উফশী)	৬.০৬	০.৫০	৬.৫৬	২.২৭	০.৬৪	২.৯১	৫.৪৬	০.৭৭	৬.২৩	২.৩০	-০.৪৬	১.৮৪	**৩.৪২**	-০.১৬	৩.২৬
আমন (মোট)	**-০.২০**	**১.৭৫**	**১.৫৫**	**০.৬৭**	**২.৯১**	**৩.৫৮**	**-১.১৭**	**১.৯০**	**০.৭৩**	**-০.৭৭**	**০.০৮**	**-০.৬৮**	-০.৫৯	**০.৬০**	**০.০১**
বোরো (স্থানীয়)	-৩.৬৫	১.১০	-২.৫৫	-৩.৮০	-১.৫৩	-৫.৩৩	-৩.৫৫	-২.৪১	-৫.৯৭	-২.৫৩	১.৪০	-১.১৩	-৭.৪৭	০.২৭	-৭.২০
বোরো (উফশী)	৬.৬৪	০.৮৫	৭.৪৯	৪.৫৯	-২.৪৮	২.১২	১১.২৬	-০.৭০	১০.৫৬	৪.১৭	১.৮৪	৬.০০	**৩.৫৩**	০.৮৩	৪.৩৬
বোরো (মোট)	**৪.৭৫**	**১.৮০**	**৬.৫৫**	**০.৮৩**	**-০.৭৫**	০.০৮	৮.০৮	**০.৩৫**	৮.৪২	**৩.৫৮**	**২.০৮**	**৫.৬৬**	**২.৮৬**	**২.৭৮**	**৫.৬৪**
ধান (স্থানীয়)	**-৩.৭৩**	**১.১২**	**-২.৬১**	**-০.৫০**	**২.৪৩**	**১.৯৩**	**-৩.০৮**	**১.১৯**	**-১.৮৯**	**-৩.৭৮**	**-০.২২**	**-৪.০০**	**-৭.৯৫**	**-০.৩৫**	**-৮.৩০**
ধান (উফশী)	**৫.৭৯**	**০.৭৭**	**৬.৫৬**	**৬.১২**	**-১.২৮**	**৪.৮৪**	**৬.৯৯**	**০.১১**	**৭.১০**	**৩.২৪**	**০.৯৯**	**৪.২৩**	**৩.৮১**	**১.০২**	**৪.৮৩**
ধান (মোট)	**০.২১**	**২.৫৯**	**২.৮০**	**০.৫২**	**২.২৮**	**২.৮০**	-০.০৬	**২.৩৮**	**২.৩২**	-০.০৪	**১.৮১**	**১.৭৭**	**০.১৯**	**২.৫৯**	**২.৭৮**

উৎস: বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

টীকা: উপাত্তে সেমি লগ ফাংশন ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার হিসাব করা হয়েছে।

[১]এটি বহুলাংশে দুটো প্রধান এগ্রোনমিক প্রতিবন্ধকতাকে নির্দেশ করে। প্রথমত, ধান চাষের নিবিড়করণ মাটির উর্বরতার জন্য ক্ষতিকর এবং এজন্য শস্য বহুমুখীকরণের কথা বলা হয়। দ্বিতীয়ত, আমন এলাকার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে তুলনামূলকভাবে কম উপযুক্ত জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়।

ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে উফশী জাতের ধান চাষের কারণে বিশেষ করে বোরো ও আমন মৌসুমে।[২] সত্তরের দশকে মোট আবাদি এলাকার ১৫ শতাংশে উফশী ধানের চাষ হতো, যা বৃদ্ধি পেয়ে আশির দশকে দ্বিগুণ হয় এবং নব্বই দশকে হয় মোট আবাদি এলাকার অর্ধেকের বেশি। এ অংশ আরও বৃদ্ধি পেয়ে সাম্প্রতিককালে (২০০০/০১-২০০৯/১০) ৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়। ফলে মোট ধান উৎপাদনে উফশী ধানের অবদান সত্তর দশকের ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে নব্বই দশকে প্রায় ৭০ শতাংশে এবং আরও বৃদ্ধি পেয়ে সাম্প্রতিককালে ৮০ শতাংশের বেশি দাঁড়ায়। মোট আবাদি এলাকা ও উৎপাদনে স্থানীয় জাতের ধানের অংশ সমপরিমাণে হ্রাস পায় (সংযুক্তি সারণি ১)।

বিভিন্ন সময়কালে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির তুলনা থেকে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম তিন দশকে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হলেও সাম্প্রতিককালে প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বগামী (সারণি ৩) হয়েছে। ধান উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার সত্তর দশকের ২.৮ শতাংশ থেকে কমে আশির দশকে ২.৩ শতাংশে এবং তা আরও কমে নব্বই দশকে ১.৮ শতাংশে দাঁড়ায়।[৩] অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে (২.৮ শতাংশ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত তিন দশকে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি (সত্তর দশকের ২.৩ শতাংশ থেকে নব্বই দশকে ১.৮ শতাংশ) নিম্নগামী ছিল ধান চাষের এলাকা ও গড় ফলন হ্রাস এ উভয়বিধ প্রভাবের কারণে। সাম্প্রতিককালে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বগামী হয়েছে প্রধানত গড় ফলন (২.৬ শতাংশ) বৃদ্ধির কারণে।

বিভিন্ন সময়কালে ধানবহির্ভূত প্রধান শস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের, আবাদি এলাকার এবং ফলনের প্রবৃদ্ধি সারণি ৪-এ দেখানো হলো। বাংলাদেশে ধান বহির্ভূত শস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে গত চার দশকে মিশ্র অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে আলু, গম, শাকসবজি, মসলা ও তৈলবীজের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক (৩ শতাংশের বেশি) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে এই প্রবৃদ্ধি সমপরিমাণে এবং একই কারণে অর্জিত হয়নি। যেমন গম চাষের এলাকা ও একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির কারণে সত্তরের দশকে (এমনকি নব্বই দশকেও) গম উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়; তবে গম চাষের এলাকা উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাওয়ায় সাম্প্রতিককালে গম উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।[৪] অন্যদিকে আবাদি এলাকা হ্রাস পাওয়ায় সত্তর, আশি ও নব্বই দশকে তৈলবীজ নিম্ন উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (এমনকি ঋণাত্মক) প্রদর্শন করেছে। তবে সাম্প্রতিককালে তৈলবীজে ব্যাপক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (১০ শতাংশ) হয়েছে ফলনে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির (১১.৮ শতাংশ) কারণে।[৫]

---

[২]১৯৭২/৭৩ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সময়কালে উফশী বোরো ও উফশী আমনের আবাদি এলাকা বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৬.৬ ও ৬.১ শতাংশ হারে, যা একই সময়কালে উফশী ধানের আবাদি এলাকা (৫.৮ শতাংশ) ও উৎপাদনের (৬.৬ শতাংশ) সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় (সারণি ৩)।

[৩]দশ বছর সময়কালে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির বিভাজন থেকে দেখা যায়, আবাদি এলাকা হ্রাসের (-০.৭ শতাংশ) কারণে এই দশকের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধি ছিল ০.৮ শতাংশ এবং ফলনের প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৫ শতাংশ; এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে আবাদি এলাকা (২.২ শতাংশ) ও ফলনের (২.৯ শতাংশ) প্রবৃদ্ধির কারণে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি (৫.১ শতাংশ) পায় (সংযুক্তি সারণি ২)।

[৪]সাম্প্রতিককালে গমের জমিতে ভুট্টার আবাদ বাড়ছে ভুট্টা উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ থাকার কারণে এবং গমের তুলনায় ভুট্টার উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বেশি। ক্রমবর্ধমান পোলট্রি খাতের হাঁসমুরগীর খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যাপক ব্যবহার এর অন্যতম প্রধান কারণ।

[৫]তৈলবীজের উৎপাদন সাম্প্রতিক সময়ে অনুকূল বাজার, উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন এবং এসব শস্যের জন্য উপযোগী অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে (হোসেন ও দেব ২০১১)।

সারণি ৪

বাংলাদেশের প্রধান ধান বহির্ভূত শস্যের আবাদি এলাকা, উৎপাদন ও ফলনের প্রবৃদ্ধি হার

(শতাংশ)

শস্য	১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০			১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০			১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০			১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০			২০০০/০১-২০০৯/১০		
	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন
গম	৩.০৭	১.৬৯	৪.৭৬	১৬.৭৬	১৩.২৫	৩০.০১	০.৬৯	-২.১০	-১.৪১	৪.৬৩	৩.১২	৭.৭৬	-৯.৪১	০.৪৪	-৮.৯৭
ডাল	০.০২	০.৬৫	০.৬৭	২.৪৭	-১.৬২	০.৮৫	-২.৬৯	০.৭৮	-১.৯১	-৩.০৮	০.৪১	-২.৬৭	-৯.৫৪	২.১৬	-৭.৩৮
তৈলবীজ	০.৮০	২.৩১	৩.১১	১.৫২	০.৫১	২.০৩	-১.৮২	০.৯৯	-০.৮৩	-১.০৬	৩.৫০	২.৪৪	-১.৭৬	১১.৭৬	১০.০০
শাকসবজি	৩.৫১	১.১১	৪.৬২	১.৮৯	-০.৩৬	১.৫৩	২.৬৮	-০.৫৬	২.১২	৪.২৬	-০.২৪	৪.০১	৬.১৫	১.৩৮	৭.৫৩
আলু	৪.২১	১.৩৭	৫.৫৮	২.২৮	০.৪৯	২.৭৮	০.০৯	০.৩৭	০.৪৬	৬.৭০	১.৪১	৮.১১	৭.০৩	১.৭৬	৮.৭৯
মসলা	২.২১	১.৬৯	৩.৯০	০.৭১	-১.৯৫	-১.২৪	-০.৩১	২.২৩	১.৯২	৫.৭৬	-৩.৭৬	২.০০	১.৯৯	১৪.৪১	১৬.৪০
চা	০.৬৫	১.৪২	২.০৭	-০.২০	৫.৯৯	৬.১৯	০.৬৫	-০.৪১	০.২৪	০.২৩	১.৮৮	২.১২	১.৩০	-০.৩১	০.৯৯
পাট	-১.৮৭	১.৫৭	-০.৩০	-০.৬৬	২.১৩	১.৪৭	-০.৯৭	১.৮৮	০.৯১	-২.৪২	৮.৯০	৬.৪৮	-০.৭৪	১.৮৬	১.১২
আখ	০.০৩	-০.১২	-০.০৯	১.৪৪	০.৫৯	২.০৩	১.৬৪	-১.৩৬	০.২৮	-১.১৭	০.৩৩	-০.৮৪	-৩.৯৮	-০.৪২	-৪.৪০

উৎস: বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

টীকা: উপাত্তে সেমি লগ ফাংশন ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার হিসাব করা হয়েছে।

গত চার দশকে আলু উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে–প্রবৃদ্ধি ঘটেছে বার্ষিক ৫.৬ শতাংশ হারে। এর প্রধান কারণ হলো আলুর আবাদি এলাকার সম্প্রসারণ (৪.২ শতাংশ), যদিও একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি (১.৪ শতাংশ) কিছুটা হলেও অবদান রেখেছে। গম (৪.৮ শতাংশ) ও শাকসবজি (৪.৬ শতাংশ) উভয় ক্ষেত্রেও উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মূলত আবাদি এলাকার (যথাক্রমে ৩.১ ও ৩.৫ শতাংশ) সম্প্রসারণের কারণে। গত চার দশকে প্রধান শস্যের মধ্যে পাট ও আখের প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমেছে। পাট চাষের এলাকা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও এর ফলনে উচ্চহারে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে, বিশেষ করে নব্বই দশকে (৮.৯ শতাংশ)। সাম্প্রতিককালে পাটের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অনুল্লেখযোগ্য (এক শতাংশের সামান্য বেশি)। আবাদি এলাকা উল্লেখযোগ্য হ্রাসের (-৯.৫ শতাংশ) কারণে সাম্প্রতিক সময়ে (২০০১-২০১০) ডালের উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত চার দশকে মসলার উৎপাদনে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি হয়েছে (৩.৯ শতাংশ), আবাদি এলাকা (২.২ শতাংশ) ও ফলন (১.৭ শতাংশ) উভয়ের প্রবৃদ্ধির কারণে। অন্যদিকে একই সময়ে চায়ের আবাদি এলাকার সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি না হওয়ায় চায়ের উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে (২.১ শতাংশ) ।

গত চার দশকে বাংলাদেশ আলু ও শাকসবজি উৎপাদনে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে; বিশেষ করে গত দশকে আলু ও শাকসবজির প্রবৃদ্ধি ছিল অভাবনীয়। আলু ও শাকসবজির উৎপাদন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মূল্যের অস্থিতিশীলতা। এ ধরনের উচ্চমূল্যসম্পন্ন (high value) ও শ্রমনিবিড় ফসলের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা কঠিন যদি না (১) এ সকল ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গুদামজাতকরণে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয় এবং (২) দেশীয় চাহিদা মিটানোর পর যে উদ্বৃত্ত থাকে তা আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। SPS বিধিবিধান এবং উন্নত দেশগুলোর জনগণের নিরাপদ খাদ্যের প্রতি উদ্বেগের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের শাকসবজির রপ্তানি বেশ কঠিন হতে পারে (হোসেন ও দেব ২০১১)।[৬] সাম্প্রতিক

[৬]এটা বিদেশে অবস্থিত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, বাংলাদেশিদের জন্য শাকসবজির বিকাশমান রপ্তানি বাজারকে মনে রেখেই বলা হয়েছে।

সময়ে মসলা উৎপাদনে ব্যাপক প্রবৃদ্ধির (১৬.৪ শতাংশ) কারণ হলো মসলার ফলনের দ্রুত প্রবৃদ্ধি (১৪.৪ শতাংশ)।

৩। প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি

দুধ, মাংস ও ডিম হচ্ছে তিনটি প্রধান প্রাণিজ দ্রব্য (livestock products)। প্রাণিজ দ্রব্যের উৎপাদন ধারা সারণি ৫-এ দেখানো হলো। [৭]

সারণি ৫

বাংলাদেশে প্রাণিজ দ্রব্যের উৎপাদন ধারা: ১৯৯১-২০১০

খাদ্যপণ্য	১৯৯১	১৯৯৫	১৯৯৯/০০	২০০৪/০৫	২০০৯/১০	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি (%)				
						১৯৯১-২০১০	১৯৯১-১৯৯৫	১৯৯৫-২০০০	২০০০-২০০৫	২০০৫-২০১০
দুধ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	১.৩৪	১.৪১	১.৬০	২.১৪	২.৩৭	৪.০৫	১.৩১	২.৬৯	৬.৭৫	২.১৫
মাংস (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	০.৪৫	০.৫১	০.৬২	১.০৬	১.২৬	৯.৪৭	৩.৩৩	৪.৩১	১৪.১৯	৩.৭৭
ডিম (মিলিয়ন)	২,০৪০	২,৫৩০	৩,৫০০	৫,৬২৩	৫,৭৪২	৯.৫৫	৬.০০	৭.৬৭	১২.১৩	০.৪২

উৎস: মুজেরী ও সাহাবউদ্দিন (২০০১), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১ এবং লেখকের হিসাব।

১৯৯১-২০১০ সময়কালে মাংস ও ডিমের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৯.৫ ও ৯.৬ শতাংশ হারে। একই সময়কালে দুধের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল (৪.১ শতাংশ)। বিভিন্ন সময়কালে (sub-periods) তিনটি প্রাণিজ দ্রব্যের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একই ধরন লক্ষ করা যায়। নব্বই দশকের প্রথমার্ধের (১৯৯১-১৯৯৫) তুলনায় গত দশকের প্রথমার্ধে (২০০০-২০০৫) প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সাম্প্রতিককালে (২০০৫-২০১০) প্রাণিজ দ্রব্যের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, বিশেষ করে মাংস ও ডিমের। তবে তাদের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে যার ফলে দেশে প্রাণিজ দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। পশুপালন ও হাঁস-মুরগি পালন ব্যাহত হওয়ার কারণ হলো পশু খাদ্যের অভাব, এভিয়ান ফ্লু ও অন্যান্য পশু সম্পর্কিত রোগের ঝুঁকি এবং দুর্বল বিপণন অবকাঠামো।

মৎস্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে যথেষ্ট জৈবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। পুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জনগণের খাদ্যাভাসে মাছ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সত্তরের দশকে মৎস্য

[৭] জব্বার (২০১০) প্রাণিজ দ্রব্যাদি বিশেষ করে দুধের উৎপাদন সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫ (HIES 2005) এ উল্লেখিত দুধের প্রকৃত ভোগের সাথে দুধের প্রাপ্যতার তুলনা করে। এটা সত্যি হলে, বাংলাদেশে প্রাণিজ দ্রব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে (সাহাবউদ্দিন প্রমুখ ২০১১)।

উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ছিল মন্থর; বস্তুতপক্ষে এ সময়ে এর প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক (-৩.৪ শতাংশ)। আশির দশকে মৎস্যের প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বগামী হয় এবং পুকুরে মাছ চাষের দ্রুত প্রসারের কারণে নব্বই দশকে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি (৬.৯ শতাংশ) পায় (সারণি ৬)। অবশ্য সাম্প্রতিককালে (২০০১-২০১০) মাছের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে।[৮]

সারণি ৬

বাংলাদেশে মাছ উৎপাদনে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার

সময়কাল/সাব-পিরিয়ড	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৭২/৭৩ - ২০০৯/১০	৩.৯৩
১৯৭২/৭৩ - ১৯৭৯/৮০	-৩.৪৪
১৯৮০/৮১ - ১৯৮৯/৯০	২.৮০
১৯৯০/৯১ - ১৯৯৯/০০	৬.৯০
২০০০/০১ - ২০০৯/১০	৫.২৩

টীকা: উপাত্তে সেমি লগ ফাংশন ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার পরিমাপ করা হয়েছে।
উৎস: পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ (Statistical Yearbook), বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

৪। বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর: সম্পদের ভিত্তির পরিবর্তন

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে কৃষি শুমারি পরিচালিত হয়েছে, যেমন ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে সর্বশেষ কৃষি শুমারি পরিচালিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত এসব কৃষি শুমারি থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের তুলনা থেকে বাংলাদেশের কৃষির সম্পদ পরিবর্তন ও উৎপাদন সংগঠনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তনে প্রতিফলিত কাঠামোগত রূপান্তর নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- কৃষির সম্পদের ভিত্তি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। গ্রামীণ খানাসমূহের অধীনে ভোগদখলীকৃত জমির পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের ৯.২ মিলিয়ন হেক্টর থেকে কমে ১৯৯৬ সালে ৮.২ মিলিয়ন হেক্টর হয়েছে। এটা নির্দেশ করছে যে, গড়ে প্রায় ৮২,০০০ হেক্টর জমি কৃষির বাইরে চলে যাচ্ছে অকৃষিজ কাজে জমির ব্যবহারের কারণে যেমন মিউনিসিপ্যালিটি ও শহর কর্তৃক এলাকার আয়তন বৃদ্ধি (৬০৭,০০০ হেক্টর), গ্রাম এলাকায় গৃহ আঙ্গিনাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি (১৪২,০০০ হেক্টর) এবং গ্রামীণ রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন

[৮]গত দশকে (২০০১-২০১০) মৎস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারের হ্রাসকে সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে। পুকুরে মাছ চাষের দ্রুত প্রসারের কারণে নব্বই দশকে অর্জিত দ্রুত প্রবৃদ্ধি হারের (৬.৯ শতাংশ) চেয়ে গত দশকে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার কম (৫.২৩ শতাংশ) ছিল। মাছ উৎপাদনের বিস্তৃতময় ভিত্তির (expanded base) কারণে সম্ভবত এরূপ উচ্চ প্রবৃদ্ধি টেকসই ও স্থায়ী হতে পারেনি। বস্তুত মাছ উৎপাদনে একটি সুস্পষ্ট ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ করা যায়; গত তিন দশক ধরে উৎপাদন প্রায় ৫ গুণ বেড়েছে (১৯৭৯-৮০ সালের ৭.৫ লাখ টন থেকে বেড়ে ২০১৩-১৪ সালে ৩৪.৬ লাখ টন হয়) । ফলে গত এক দশকে মাথাপিছু মাছ ভোগের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। সর্বশেষ FAO প্রতিবেদন অনুযায়ী অনেক কম উৎপাদন এলাকা নিয়েও বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ, বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে চীন, ভারত ও মিয়ানমার।

(২৫২,০০০ হেক্টর)।[৯] ফলে কৃষি জমি বা খামারের গড় আয়তন/আকার ১৯৬০ সালের ১.৭ হেক্টর থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালে ০.৯১ হেক্টর, ১৯৯৬ সালে ০.৬৮ হেক্টর এবং ২০০৮ সালে ০.৪ হেক্টরে হ্রাস পেয়েছে।

- কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি কমে যাচ্ছে। কৃষি খানার সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ১০ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ১১.৮ মিলিয়ন এবং আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ১৪.৯ মিলিয়নে দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সকল গ্রামীণ খানার ৩৪ শতাংশ ছিল অকৃষি খানা, ১৯৮৩-৮৪ সালে যা ছিল ২৭ শতাংশ এবং তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ৪২ শতাংশ হয়। অন্যের খামারে কৃষি শ্রম প্রদানকারী খানার হার ১৯৮৩-৮৪ সালের (সকল গ্রামীণ খানার শতাংশ হিসাবে) ২২.৬ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯৬ সালে ১৬.৯ শতাংশ এবং তা আরও কমে ২০০৮ সালে ৯.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। এ শ্রেণীর খানার লোকজন গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন ছাড়াও গ্রাম এলাকায় কৃষি কাজ ছেড়ে অকৃষিজ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হচ্ছে। ভূমিহীন খানার পেশাগত পরিবর্তন ঘটছে গ্রামীণ এলাকার ব্যবসা ও পরিবহন খাতে (গ্রামীণ রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণসহ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিজ দ্রব্যের উদ্বৃত্তের বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি, কৃষি প্রবৃদ্ধির সংযোগ প্রভাব এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে। এভাবে কৃষি খাত অধিকতর উৎপাদনমূলক অকৃষি খাতে সম্পদ (জমি ও শ্রমশক্তি) নিয়োজিত করছে এবং এর মাধ্যমে সার্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।[১০] কৃষির রূপান্তর থেকে আরও দেখা যায়, কৃষিতে জমি ও শ্রম শক্তির উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি কৃষি উৎপাদনের সার্বিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর হয়েছে (হোসেন ২০০০)।

- গত তিন দশকেরও অধিককাল ধরে কৃষিখাতে পুঁজির বৃদ্ধিতে (capital accumulation) একটি ঊর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষি বিনিয়োগের দ্রুত প্রবৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তিরা হলো ক্ষুদ্রাকার সেচ যন্ত্রপাতিতে (যেমন টিউবওয়েল ও শক্তিচালিত পাম্প) বিনিয়োগকারী। সেচ যন্ত্রপাতির মালিক এমন গ্রামীণ খানার সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ২৭৪,০০০ থেকে বেড়ে ১৯৯৬ সালে ৯৩৩,০০০ হয়েছে এবং খানার মালিকানায় থাকা যন্ত্রপাতির সংখ্যা একই সময়কালে ৩.১২ লাখ থেকে বেড়ে ১১ লাখ হয়েছে -- বছরে ১১ শতাংশ হারে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের অধীন আবাদি জমির পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৪৮ শতাংশে এবং তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ৬৩ শতাংশে উন্নীত হয়। অন্যান্য কৃষি কাজের ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকীকরণ (mechanisation) দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে যেখানে মাত্র

[৯]কৃষি শুমারি ২০০৮ থেকে দেখা যায়, গ্রামীণ খানা কর্তৃক ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ২০০৮ সালে ছিল ৮.৯ মিলিয়ন হেক্টর। ইতোপূর্বে পরিচালিত শুমারিসমূহের তুলনায় ২০০৮ সালের কৃষি শুমারিতে কিছু সংজ্ঞাগত পরিবর্তনের কারণে প্রধানত তা হয়েছে।

[১০]এটা স্বীকার্য যে, সম্পদ ব্যবহারে অকৃষিজ খাত সমরূপভাবে উৎপাদনশীল নয়। অকৃষিজ খাতের প্রবৃদ্ধির pull ও push ফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি অকৃষিজ খাতের ভূমিকাকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। অকৃষিজ খাতের প্রবৃদ্ধির pull ও push ফ্যাক্টরের উপর বিস্তারিত আলোচনা এবং অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন যথাক্রমে রহমান (২০১৩) এবং হোসেন ও বায়েস (২০০৯)।

২৭,০০০ খানা পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টরের মালিক ছিল, ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১,০০০ এবং আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ১৬২,৮১৮ তে দাঁড়ায়। কৃষিতে হ্রাসমান শ্রম সম্পদের স্থলে পুঁজির ব্যবহার (যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের ফলে) একদিকে যেমন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে, তেমনি অন্যদিকে উচ্চতর কৃষি মজুরি প্রদানে কৃষকদের সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

৫। বাংলাদেশ কৃষির রূপান্তরঃ উৎপাদন সংগঠনে পরিবর্তন

- সীমিত ভূমি সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপের কারণে কৃষিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর/কৃষকের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০ হেক্টর (২৪.৭ একর) জমির মালিক এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮,০০০, ১৯৯৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৯,০০০ এবং তা আরও কমে ২০০৮ সালে হয় ১৩,৭২১। অন্যদিকে ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রায় ৫.৪ মিলিয়ন পরিবার (মোট গ্রামীণ পরিবারের ৪৬ শতাংশ) ছিল কার্যত ভূমিহীন (০.২ হেক্টর বা ০.৪৯ একরের চেয়ে কম জমির মালিক), ১৯৯৬ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ১০ মিলিয়নে (মোট গ্রামীণ পরিবারের ৫৬ শতাংশ) এবং ২০০৮ সালে আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ মিলিয়নে (মোট গ্রামীণ পরিবারের ৬৩ শতাংশ)।[১১]

- ডেমোগ্রাফিক বা জনতাত্ত্বিক চাপের কারণে মাঝারি ও বৃহৎ হোল্ডিংসগুলোর বিভাজন ঘটছে। যার কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৯৬ সালে মোট খামারের ৮১ শতাংশ ছিল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক হোল্ডিংস যারা মোট জমির ৪১ শতাংশ ব্যবহার করত। এই অংশ বেড়ে ২০০৮ সালে যথাক্রমে ৮৪ ও ৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। এসব সংখ্যা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, টার্গেটিং এপ্রোচ অনুসরণ করে কৃষি সহায়তা কর্মসূচি (support service) প্রণয়ন করা হলে তা অর্থপূর্ণ ও কার্যকর হবে না যেহেতু বেশির ভাগ খানার জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের চেয়ে কম।

- জমির মালিকানা/ভোগদখলীস্বত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্গাদারদের মধ্যে বেশির ভাগই হলো মালিক-বর্গাদার যাদের নিজস্ব চাষের জমি রয়েছে এবং খামার সম্পদের যেমন পারিবারিক শ্রম ও হালের বলদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য আরও জমি বর্গা নেয়। স্বত্বাধিকারী কৃষকদের চেয়ে বর্গাদার কৃষকদের খামারের গড় আকার বেশি, যা ১৯৬০ সালের কৃষি শুমারি সহ সকল কৃষি শুমারিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্গা চাষের অধীন জমির অনুপাত ১৯৮৩-৮৪ সালের ১৭ শতাংশ (মোট ব্যবহৃত জমির পরিমাণ) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ২২ শতাংশে এবং আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ২৭ শতাংশে উন্নীত হয়। এ পরিবর্তনের কারণ হলো গ্রামীণ জনসংখ্যার দ্রুত গ্রাম থেকে শহরে অধিগমনের কারণে অনুপস্থিত মালিকানাধীন (absentee landownership) জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া

[১১]বাংলাদেশে পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার বহুল বিতর্কিত বিষয়। জমির মালিকানার উপর ceiling ৩ হেক্টর আরোপ করা হলে ১০ মিলিয়ন ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে পুনর্বণ্টনের জন্য প্রাপ্ত জমির পরিমাণ হবে প্রায় ০.৯ মিলিয়ন হেক্টর (মোট জমির ১১ শতাংশ), যা গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারগুলোর জীবনযাত্রায় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করবে না (হোসেন ২০০০)।

এবং সহায় সম্পদহীন দরিদ্র খানা কর্তৃক গ্রামীণ অকৃষি পেশা গ্রহণের কারণে প্রান্তিক জমির পরিত্যক্ত হওয়া।

- বর্গাচাষ ব্যবস্থার কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভাগচাষের বর্গাপ্রথা (sharecropping) যা কৃষিতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে তার স্থলে নির্দিষ্ট খাজনা (fixed-rent) ও মধ্যমেয়াদি ইজারা ভিত্তিক বর্গাচাষের (medium-term leasing arrangements) প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬০ সালে যেখানে বর্গাচাষকৃত জমির ৯১ শতাংশ জমি ভাগচাষের অধীনে ছিল, তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ৭৪ শতাংশে, ১৯৯৬ সালে ৬২ শতাংশে এবং আরও হ্রাস পেয়ে ২০০৮ সালে ৩৯ শতাংশে নেমে আসে।[১২] বাজার, সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক শক্তির প্রয়োগের ফলে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তন ঘটছে।

৬। উপসংহার

বিগত চার দশকে দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি এখনো প্রধানত কৃষিভিত্তিক। কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং দারিদ্র্য নিরসনে কৃষিখাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

বিগত দুই দশকে কৃষিখাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। অবশ্য কৃষির প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হলেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম ছিল। নব্বই দশকের তুলনায় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় পরবর্তীকালে শস্য উপখাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন। বস্তুতপক্ষে মৎস্য ব্যতীত কৃষির অন্যান্য সব উপখাতে পরবর্তী সময়কালে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। নব্বই দশকের তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে মৎস্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তা না হলে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার আরও বেশি হতো।

জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত কৃষি শুমারি থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের তুলনামূলক পর্যালোচনায় বাংলাদেশে কৃষি খাতের রূপান্তর (transformation of agriculture), বিশেষ করে কৃষি সম্পদ ভিত্তির (resource base) এবং উৎপাদন সংগঠনের (organisation of production) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কৃষি সম্পদের ভিত্তি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। কমে যাচ্ছে কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি। অন্যদিকে কৃষিখাতে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে কৃষিকার্যে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে। কৃষিতে হ্রাসমান শ্রমশক্তির স্থলে বর্ধিত হারে পুঁজির ব্যবহার একদিকে যেমন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, তেমনি অন্যদিকে উচ্চতর কৃষি মজুরি প্রদানে কৃষকদের সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

উৎপাদন সংগঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমেও বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সীমিত ভূমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে কৃষিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর

[১২]বর্গাদাররা যখন উপকরণ-নিবিড় আধুনিক জাত চাষ করে তখন তারা নির্দিষ্ট খাজনা/ভাড়া ভিত্তিক বর্গাচাষ ব্যবস্থা ব্যবহার করে যা তাদেরকে কৃষি উপকরণে বর্ধিত বিনিয়োগের ফল ভোগের সুযোগ প্রদান করে। তবে তারা বন্যা ও খরার কারণে সৃষ্ট শস্য চাষের ঝুঁকি শেয়ার করার নিমিত্তে বৃষ্টিনির্ভর শস্যের ক্ষেত্রে ভাগচাষ বর্গা প্রথা অব্যাহত রাখে।

সংখ্যা বাড়ছে। উপরন্তু জনতাত্ত্বিক (demographic) চাপের কারণে মাঝারি ও বৃহৎ খানার বিভাজন ঘটছে। এ কারণেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারের সংখ্যা বাড়ছে। একই সঙ্গে জমির মালিকানা ও ভোগদখলী স্বত্বের (land tenure situation) ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্গাচাষ ব্যবস্থার কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ভাগচাষীর বর্গা প্রথার (sharecropping tenancy) স্থলে নির্দিষ্ট খাজনা (fixed rent) ও মধ্যমেয়াদি ইজারাভিত্তিক বর্গাচাষের (medium-term leasing arrangements) প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্ষেপে বাজার, সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক শক্তির চাপের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে।

গ্রন্থপঞ্জি

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics), *Census of Agriculture and Livestock, Vol. 1 to Vol. 6, 1983-84*, BBS, Dhaka.

——*Census of Agriculture, Vol. 1 to Vol. 3, National Series, 2008*, BBS, Dhaka.

——*Census of Agriculture, Vol. 1 to Vol. 3, 1996*, BBS, Dhaka.

——*Statistical Yearbook*, Various Years, BBS, Dhaka.

Hossain, M. (2000): *Recent Development and Structural Change in Bangladesh Agriculture: Issues for Reviewing Strategies and Policies, Changes and Challenges, A Review of Bangladesh's Development 2000*, Centre for Policy Dialogue and The University Press Limited.

Hossain, M. and A. Bayes (2009): *Rural Economy and Livelihoods: Insights from Bangladesh*, A.H. Development Publishing House, Dhaka.

Hossain, M. and U. K. Deb (2009): *Food Security and Containing Price Escalation: Facts and Implications for Policy in Development of Bangladesh with Equity and Justice*, Centre for Policy Dialogue, Dhaka.

Jabbar, M. A. (2010): *Policy Barriers for Dairy Value Chain Development in Bangladesh with a Focus on the North-West Region*, Report prepared for CARE Bangladesh and Unnayan Samunnay, Dhaka.

Ministry of Finance, *Bangladesh Economic Review, 2011*.

Mujeri, M. K. and Q. Shahabuddin (2001): *Bangladesh Livestock Subsector Review*, Report prepared for Asian Development Bank, Mimeo.

Shahabuddin, Q., M. Yunus and Z. Ali (2011): "Developing Non-crop Agriculture in Bangladesh: Present Status and Future Development," Chapter 2 in *Background Papers of Sixth Five Year Plan 2011-2015, Vol. 2, Economic Sectors* edited by M.K. Mujeri and Shamsul Alam, Bangladesh Institute of Development Studies and General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Shahabuddin, Q. (2014): *Bangladesh: Agriculture and Food Security Policies*, Report prepared for the World Bank, mimeo.

সংযুক্তি

সারণি ১

বাংলাদেশে ধান শস্যের আবাদি এলাকা, উৎপাদন ও ফলন

শস্য	আবাদি এলাকা (%)				উৎপাদন (%)				ফলন (মেট্রিক টন/হেক্টর)			
	১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০
আউশ (স্থানীয়)	২৮.৫৫	২৩.৩১	১২.১৭	৮.২৬	১৮.৮২	১৪.০৪	৬.১৫	২.৬৭	০.৭৯	০.৮৭	০.৯৩	০.৭৭
আউশ (উফশী)	৩.০৩	৪.৫০	৪.১৮	৪.৮৬	৫.৮১	৬.০৪	৪.০৫	৪.৩৬	২.৪৩	১.৯১	১.৭৮	২.১৩
আউশ (মোট)	**৩১.৫৭**	**২৭.৮১**	**১৬.৩৫**	**১৩.১২**	**২৪.৬৩**	**২০.০৮**	**১০.১৯**	**৭.০৩**	**০.৯৪**	**১.০৩**	**১.১৫**	**১.৫৮**
আমন (স্থানীয়)	৫১.৫৬	৪৪.৫০	৩৩.০৭	২১.৭৩	৪৬.৩০	৩৭.২৫	২২.৩৪	১২.৬৫	১.০৯	১.১৯	১.২৪	১.৩৮
আমন (উফশী)	৬.১৮	১১.৪০	২২.৩৯	২৯.৯৪	১১.০০	১৫.৭৬	২৬.০১	৩০.৩২	২.১৬	২.০০	২.১৪	২.৪০
আমন (মোট)	**৫৭.৭৫**	**৫৫.৯০**	**৫৫.৪৭**	**৫১.৬৭**	**৫৭.৩০**	**৫২.৯১**	**৪৮.৩৫**	**৪২.৯৭**	**১.২০**	**১.৩৬**	**১.৬০**	**১.৯৭**
বোরো (স্থানীয়)	৪.৫৩	৩.২৬	২.৪৭	১.৫৪	৪.৮৮	৩.৩৬	১.৯৯	১.২৩	১.২৭	১.৪৫	১.৪৮	১.৯০
বোরো (উফশী)	৬.১৫	১৩.০৩	২৫.৭১	৩৩.৬৭	১৩.২০	২৩.৬৫	৩৯.৪৬	৪৮.৭৭	২.৬১	২.৬৮	২.৮০	৩.৩৯
বোরো (মোট)	**১০.৬৮**	**১৬.২৯**	**২৮.১৯**	**৩৫.২১**	**১৮.০৮**	**২৭.০১**	**৪১.৪৫**	**৫০.০০**	**২.০৪**	**২.৪১**	**২.৬৮**	**৩.১৪**
ধান (স্থানীয়)	**৮৪.৬৫**	**৭১.০৭**	**৪৭.৭১**	**৩৩.২৯**	**৬৯.৯৯**	**৫৪.৫৫**	**৩০.৪৮**	**১৬.৫৬**	**১.০০**	**১.১০**	**১.১৭**	**১.৯০**
ধান (উফশী)	**১৫.৩৫**	**২৮.৯৩**	**৫২.২৯**	**৬৬.৭১**	**৩০.০১**	**৪৫.৪৫**	**৬৯.৫২**	**৮৩.৪৪**	**২.৩৮**	**২.২৮**	**২.৪৪**	**২.৮৭**
ধান (মোট)	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১.২১**	**১.৪৪**	**১.৮৪**	**২.৫৩**

উৎস: বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

সারণি ২

বাংলাদেশে ধান শস্যের আবাদি এলাকা, উৎপাদন ও ফলনের প্রবৃদ্ধির হার

(%)

শস্য	১৯৭২/৭৩-২০০৯/১০			১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০			২০০০/০১-২০০৪/০৫			২০০৫/০৬-২০০৯/১০		
	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন	এলাকা	ফলন	উৎপাদন
আউশ (স্থানীয়)	-৫.৮৬	১.৩৫	-৪.৫১	-৬.৩১	০.১৬	-৬.১৫	-৮.৬২	-০.০৮	-৮.৭০	-১১.৩০	-২.৯০	-১৪.২০
আউশ (উফশী)	২.০৩	-০.৪৩	১.৬০	২.৩৫	০.৯৮	১.৩৭	-০.৬২	-০.৬৫	-১.২৭	৮.১৩	২.৫২	১০.৬৫
আউশ (মোট)	**-৩.৯২**	**১.৮১**	**-২.১১**	**-৪.১২**	**০.৯১**	**-৩.২১**	**-৫.৪৭**	**-০.৪৫**	**-৫.৯২**	**০.৬৩**	**১.২১**	**১.৮৪**
আমন (স্থানীয়)	-২.৯৮	০.৬৩	-২.৩৫	-২.৯৩	-০.৭৫	-৩.৬৮	-৪.৪৩	-১.৮১	-৬.২৪	-৪.৮২	-০.০৬	-৪.৯০
আমন (উফশী)	৬.০৬	০.৫০	৬.৫৬	২.৩০	-০.৪৬	১.৮৪	**১.১৮**	-০.৯০	০.২৮	৪.৩৭	১.৫৭	৫.৯৪
আমন (মোট)	**-০.২০**	**১.৭৫**	**১.৫৫**	**-০.৭৭**	**০.০৮**	**-০.৬৮**	**-১.৫১**	**-০.৪৯**	**-২.০০**	**০.৯৯**	**২.১৩**	**৩.১২**
বোরো (স্থানীয়)	-৩.৬৫	১.১০	-২.৫৫	-২.৫৩	১.৪০	-১.১৩	-১.১৬	৩.৮২	২.৬৬	-১০.৭৫	-০.৪৩	-১১.১৮
বোরো (উফশী)	৬.৬৪	০.৮৫	৭.৪৯	৪.১৭	১.৮৪	৬.০০	**২.১৬**	১.৭৩	৩.৮৯	৯.০৩	-২.২৮	৬.৭৫
বোরো (মোট)	**৪.৭৫**	**১.৮০**	**৬.৫৫**	**৩.৫৮**	**২.০৮**	**৫.৬৬**	**১.৯৯**	**১.৮৬**	**৩.৮৫**	**৩.৯৫**	**২.৭৪**	**৬.৬৯**
ধান (স্থানীয়)	**-৩.৭৩**	**১.১২**	**-২.৬১**	**-৩.৭৮**	**-০.২২**	**-৪.০০**	**-১.৫১**	**-০.৮৭**	**-২.৩৮**	**-৮.৮২**	**-১.৯৬**	**-১০.৭৮**
ধান (উফশী)	**৫.৭৯**	**০.৭৭**	**৬.৫৬**	**৩.২৪**	**০.৯৯**	**৪.২৩**	**১.৫৮**	**২.২৭**	**৩.৮৫**	**৮.৮৭**	**-০.২১**	**৮.৬৬**
ধান (মোট)	**০.২১**	**২.৫৯**	**২.৮০**	**-০.০৪**	**১.৮১**	**১.৭৭**	**-০.৬৬**	**১.৪৬**	**০.৮০**	**২.১৫**	**২.৯৫**	**৫.১০**

উৎস: বিবিএস ও লেখকের হিসাব।

টীকা: উপাত্তে সেমি লগ ফাংশন ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির হার হিসাব করা হয়েছে।